হ্যান্ডবুক

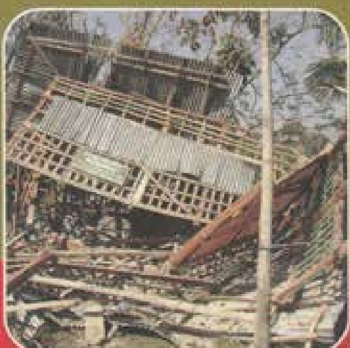

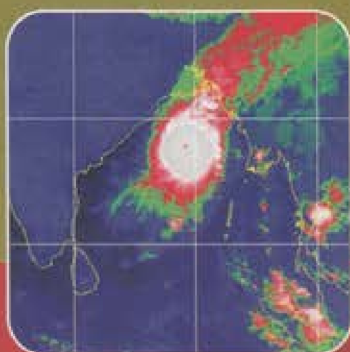

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভ

MANGROVE IN DISASTER RISK REDUCTION

হ্যান্ডবুক

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভ

MANGROVE IN DISASTER RISK REDUCTION

হ্যান্ডবুক : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভ
Mangrove in Disaster Risk Reduction

রচনা ও সম্পাদনা	**Written and Edited by**
ড. এম সাহাদাত হোসেন	Dr. M Shahadat Hossain
ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারীজ	Institute of Marine Sciences and Fisheries
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	University of Chittagong
ড. স্যাম ওয়াং	**Dr. Sam Wong**
স্কুল অব আর্থ এন্ড এনভারনমেন্ট	School of Earth and Environment
লীড্‌স ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য	University of Leeds, United Kingdom
মোঃ শামছুদ্দোহা	**Md. Shamsuddoha**
পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ	Participatory Research & Developement Initiatives
শ্যামলী, ঢাকা	Shyamoli, Dhaka
রচনা সহযোগিতায়	**Assisted by**
ফরিদ আহ্‌মেদ সাগর	Farid Ahmed Sagar
পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ	Participatory Research & Developement Initiatives

প্রকাশকাল	**Date of Publication**
ফেব্রুয়ারী ২০০৯	February 2009
ডিজাইন	**Design**
আর্টিস্টিক, ঢাকা	Artistic, Dhaka
মুদ্রণ	**Printing**
উপকূল, ০১৭১১-৮৯৭৯৫৯	Upokul, 01711-897959

The handbook **'Mangrove in Disaster Risk Reduction'** has been published with the financial support from the British Council Bangladesh under its Higher Education Link project titled ' Conserving Mangrove Forest to Mitigate the Impact of Climate Change in the Coast of Bangladesh'

'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভ' শীর্ষক হ্যান্ডবুকটি ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ - এর Higher Education Link Project এর অর্থায়নে গৃহীত 'বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব হ্রাসে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত।

অবতরণিকা

বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৩২ ভাগ উপকূলীয় অঞ্চলভূক্ত যেখানে দেশের ২৮ ভাগ লোকের বাস। ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে বাংলাদেশের সমগ্র উপকূল ভাগ দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থ। বঙ্গোপসাগরের অগভীর ও মৃদু ঢাল, নিচু ও সমতল উপকূলভাগ, বিস্তীর্ণ ও উন্মুক্ত তটরেখা ইত্যাদির ফলে মধ্যম ধরণের সামুদ্রিক ঘূর্ণিপ্রবাহও বাংলাদেশের উপকূলে প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় দুর্যোগ প্রস্তুতির ঘাটতি, জনসাধারনের সামাজিক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপ্রস্থতা, ব্যাপক হারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদির কারণে উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থতা ক্রমেই বাড়ছে। গত কয়েক দশকে মানুষ্য সৃষ্ট অস্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশেষ করে পৃথিবীর বারীমন্ডল ও জীব মন্ডলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দূষনের ফলে সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ সংক্রমণের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলেছে।

স্থায়িত্বশীল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রতিবেশ সমূহের সংরক্ষণও জরুরী। উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ প্রতিবেশ সমূহের মধ্যে ম্যানগ্রোভ' এর গুরুত্ব এবং এর সংরক্ষণ মূল্য ব্যাপক। গবেষণায় দেখা গেছে যে ম্যানগ্রোভ বেষ্টনী সাধারণ জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বা শক্তির ৭০-৯০ শতাংশ প্রশমণ করতে পারে। এছাড়াও ম্যানগ্রোভের সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্য অপরিসীম।

বাংলাদেশের উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকি ও ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভ বনের ভুমিকা সবিস্তারে আলোচনার পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষনের করনীয় বিষয়গুলোও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণ, সরকারী বেসরকারী সংগঠণ ও সরকারী পর্যায়ের নীতি নির্ধারকেরা ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্থায়িত্বশীল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল হিসেবে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণে আরো উদ্যোগী হবেন সে লক্ষ্যেই আমাদের এ প্রকাশনা। **"দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভ"** শীর্ষক হ্যান্ডবুকটি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য "ব্রিটিশ কাউন্সিল"- বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ ও উপযুক্ত অঞ্চলে নতুন ভাবে ম্যানগ্রোভ বন সৃজনে এই হ্যান্ডবুকটি একটি সচেতনতামূলক তথ্য গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ড. এম সাহাদাত হোসেন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

মোঃ শামছুদ্দোহা
পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড
ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ

ড. স্যাম ওয়াং
লীড্স ইউনিভার্সিটি
যুক্তরাজ্য

সূচিপত্র

হ্যান্ডবুক পরিচিতি ০৫

আলোচ্য বিষয় -১ ০৭
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগলিক পরিচিতি ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আলোচ্য বিষয়-২ ১২
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থতা

আলোচ্য বিষয়-৩ ১৭
দুর্যোগ, ঝুঁকি, আপদ ও বিপদগ্রস্থতার সম্পর্ক

আলোচ্য বিষয়-৪ ২১
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা

আলোচ্য বিষয়-৫ ২৬
পণ্য ও সেবার উৎস হিসেবে ম্যানগ্রোভ

আলোচ্য বিষয়-৬ ৩০
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ সমূহ : স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

আলোচ্য বিষয়-৭ ৩৪
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নের উদ্যোগ ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ

হ্যান্ডবুক পরিচিতি

প্রকাশের উদ্দেশ্য

ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সস এন্ড ফিসারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, লিডস ইউনিভার্সিটি যুক্তরাজ্য এবং পার্টিসিপেটরী রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত "দুর্যোগ হ্রাসে ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব" শীর্ষক হ্যান্ডবুকটিতে মূলতঃ বিশেষ প্রতিবেশ হিসেবে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ হ্যান্ডবুকটি প্রশিক্ষণ মডিউল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

এ হ্যান্ডবুকটি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ঝুঁকি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা, ম্যানগ্রোভের বিস্তার, পণ্য ও সেবার উৎস হিসেবে ম্যানগ্রোভ, ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের কারণ ও ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ সংরক্ষণে করণীয় বিষয়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে নতুনভাবে ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করা যাবে তাও চিহ্নিত করা হয়েছে।

অধ্যায়সমূহ

আলোচ্য বিষয় -১ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা; আলোচ্য বিষয়-২ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থতা; আলোচ্য বিষয়-৩ দুর্যোগ, ঝুঁকি, আপদ ও বিপদগ্রস্থতার সম্পর্ক; আলোচ্য বিষয়-৪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা; আলোচ্য বিষয়-৫ পণ্য ও সেবার উৎস হিসেবে ম্যানগ্রোভ; আলোচ্য বিষয়-৬ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ সমূহ : স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত; আলোচ্য বিষয়-৭ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নের উদ্যোগ ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ

যাদের জন্য

উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও স্থায়ীত্বশীল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কর্মকান্ডে জড়িত ও ভবিষ্যতে জড়িত হতে আগ্রহী উন্নয়ন কর্মী, উপকূলীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারক, জনপ্রতিনিধি, এদের জন্য হ্যান্ডবুকটি একটি সহায়ক উপকরণ হতে পারে।

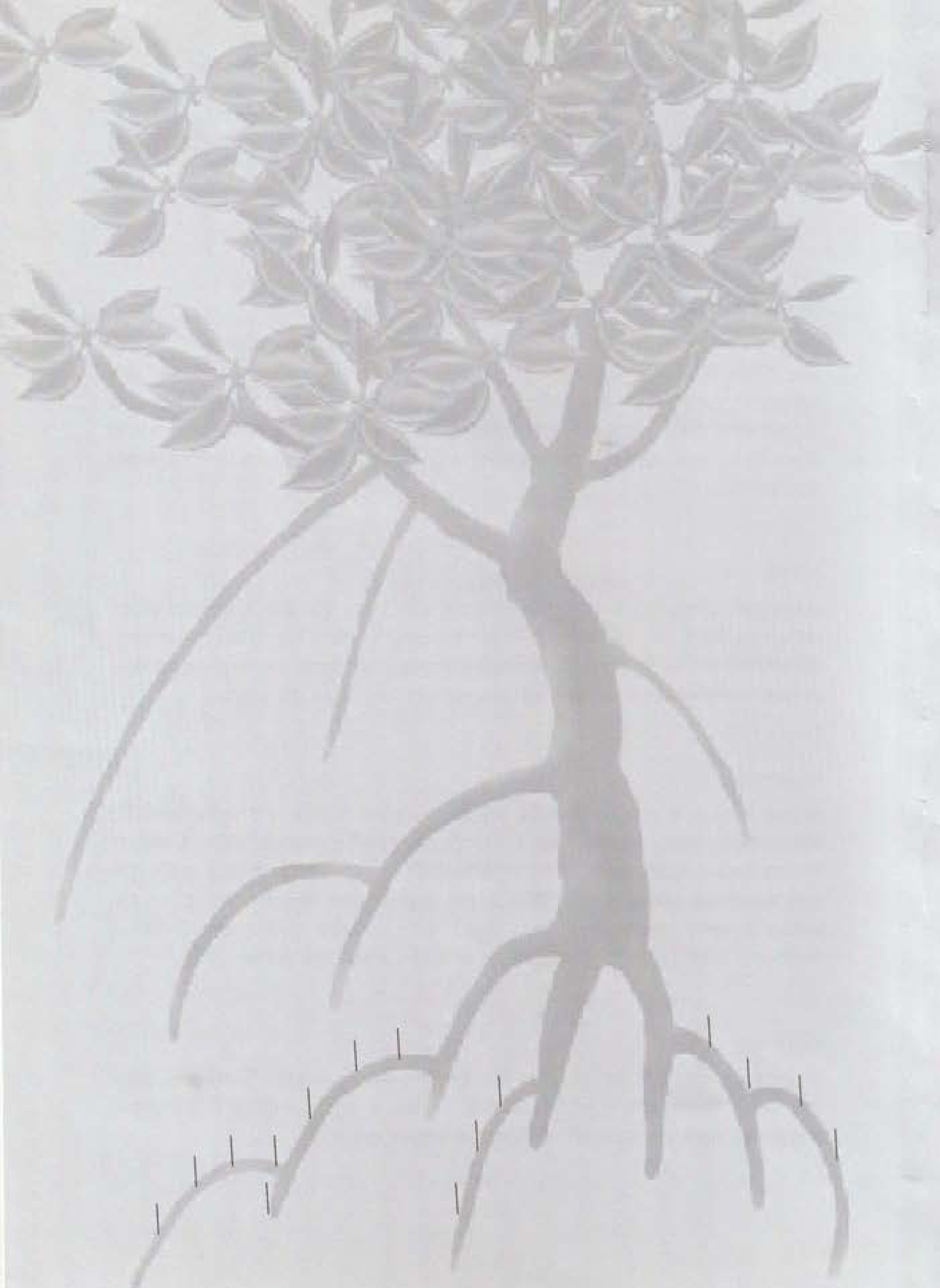

আলোচ্য বিষয় - ১

আলোচ্য বিষয় -১

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

Geographical location of the coastal areas of Bangladesh and socio-economic condition of coastal polpulation.

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষত্ব ও বিশেষ প্রতিবেশ (ইকোসিস্টেম) সম্পর্কে জানা।

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পরিচিতি, ভৌগোলিক অবস্থান।

উপকূলে বসবাসকারী জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান।

মূল আলোচনা

বাংলাদেশ বঙ্গোসাগরের তীরবর্তী একটি উপকূলীয় দেশ যার, পুরো দক্ষিণভাগে রয়েছে প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩২ ভাগ অর্থাৎ ৪৭,২১১ বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় অঞ্চলভুক্ত। প্রশাসনিকভাবে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় উপকূলীয় জেলা হিসেবে বিবেচিত। ২০০১ সালের জনজরিপ অনুসারে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় সাড়ে তিন কোটি অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ ভাগ লোক উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। অন্যদিকে আই.পি.সি.সি (Inter governmental Panel on Climate Change-IPCC) ২০০১ এর হিসেবে দেখা যায় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ এবং ৪০ ভাগ উপকূলীয় অঞ্চলের যথাক্রমে ৩০ কিলোমিটার এবং ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করে। বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ উপকূলীয় অঞ্চল যুগ যুগ ধরে লাখো মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি মাছ ধরা, মাছ চাষ, কৃষি কাজ ও লবণ উৎপাদন ইত্যাদি উপকূলীয় জনসাধারণের জীবনজীবিকার অন্যতম উপায় হিসেবে আজও বিবেচিত।

যদিও গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় ভূমির মালিকানাকেই আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রধান সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের মাথাপিছু ভূমির প্রাপ্যতা দেশের অন্যান্য মূল ভূ-খন্ডের তুলনায় কম। ১৯৯৬ সালের কৃষি জরিপে দেখা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চলের শতকরা ৫৩ ভাগ পরিবার কার্যকরভাবে ভূমিহীন (যাদের মাথাপিছু ভূমি ৫০ শতাংশেরও কম)। এই ৫৩ ভাগ পরিবারের মালিকানায় আছে মাত্র ১৭ ভাগ ভূমি। আবার শতকরা ১২ ভাগ পরিবারের মালিকানায় রয়েছে প্রায় ৪৭ ভাগ ভূমি।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল তিনটি ভাগে বিভক্ত
যথা দক্ষিণ-পশ্চিম, মধ্যবর্তী ও দক্ষিণ-পূর্ব

সারণী ১ : ভূমি মালিকানার ছক

একর/শতাংশ	বসতবাড়ি	আয়তন/পরিমাণ	মন্তব্য
কোন ভূমি নেই	০.২	০.০	৫৩.৪ শতাংশ পরিবার কার্যকরভাবে ভূমিহীন
কোন কৃষি জমি নেই	২১.৩	৪.৭	
কৃষি জমি ৫ শতাংশের কম	৮.০	৪.৬	
৫-৪৯ শতাংশ	২৩.৯	১০.২	
৫০-৯৯ শতাংশ	১৩.৮	১০.০	
১০০-১৪৯ শতাংশ	৯.৬	১০.৭	
১৫০-২৪৯ শতাংশ	১০.৫	১৬.২	
২৫০-৭৪৯ শতাংশ	১১.১	৩৩.১	
৭৫০ এর বেশী	১.৬	১৩.৫	
মোট	১০০.০০	১০০.০০	

সূত্র ঃ উপকূলীয় জীবনযাত্রা, আই সি জেড এম, জুন ২০০৩

অন্যদিকে উপকূলীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেশের অন্যান্য মূল ভূ-খন্ডের তুলনায় বেশী। ১৯৯১ হতে ২০০১, এই অন্তবর্তিকালীণ বছরগুলোতে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে গড়পরতা বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১.২৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ ধারায় চলতে থাকলে ২০২০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে চার কোটিতে। ফলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ আরও কমবে এবং জীবিকার অন্বেষণে আরও অধিক মানুষ শহরমুখী হবে।

সারণী ২ : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা

সাল	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			শহুরে জনসংখ্যা (শতকরা হিসাবে)
	উপকূলীয় গ্রাম	উপকূলীয় শহর	মোট	
২০০১	২৭	৮	৩৫	২৩
২০১০	২৫	১৪	৩৯	৩৬
২০২০	২২	২২	৪৪	৫০

সূত্র ঃ উপকূলীয় জীবনযাত্রা, আই সি জেড এম, জুন ২০০৩

আবার উপকূলীয় অঞ্চল সমূহের কৃষি ভিত্তিক জীবিকার ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে শতকরা ৩১ ভাগ মধ্যম কৃষি পরিবার তাদের নিজস্ব জমি-জমার উপর ভিত্তি করে

জীবিকার সংকুলান করতে পারত। অথচ ১৯৯৬ সালের তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, মধ্যম কৃষি পরিবারের এ সংখ্যা শতকরা ৩১ থেকে নেমে ১১ তে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সালে অ-কৃষি পরিবার ছিল শতকরা ১৯ ভাগ, যা ১৯৯৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০-এ। অর্থাৎ উপকূলীয় অঞ্চল সমূহের কৃষি ভিত্তিক জীবিকার ধারা ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে, যেমন;

- মধ্যম কৃষি পরিবার ক্রমে ক্ষুদ্র কৃষক ও পরবর্তীতে অ-কৃষি পরিবারে পরিণত হচ্ছে, ফলে
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষি পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে

ভূমির পরিমান	স্তর	পরিবার (শতকরা হিসেবে)	
		১৯৬০	১৯৯৬
কৃষি জমি, ৫ শতাংশের কম	অ-কৃষি পরিবার	১৯	৩০
৫-২৪৯ শতাংশ	ক্ষুদ্র কৃষি পরিবার	৫১	৫৭
২৫০-৭৪৯ শতাংশ	মধ্যম কৃষি পরিবার	৩১	১১
৭৫০ শতাংশ বা তারও বেশী	বৃহৎ কৃষি পরিবার	৯	২
	মোট	১০০	১০০

সারণী ৩ : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি মালিকানার ধরণ ও পরিবার প্রতি ভূমি হ্রাসের প্রবণতা।

এছাড়াও বিভিন্ন জরিপ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপকূলীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, গড় আয়, মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি দেশের মুল ভূখন্ডের চেয়ে অনেক কম। এ সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকির পাশাপাশি উত্তরোত্তর বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও ভয়াবহতা। বস্তুত উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের দুঃখ ও স্বপ্ন, তাদের সমস্যা ও সংগ্রাম, তাদের অসহায়ত্ব ও প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি স্বাতন্ত্র অবস্থান বা পৃথকত্বতা রয়েছে, যা তাদের জীবনযাত্রাকে পরিষ্কারভাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রা থেকে আলাদা করে রেখেছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এমন সব প্রতিবেশ (ইকোসিস্টেম) রয়েছে যার গুরুত্ব ও সংরক্ষণ মূল্য ব্যাপক। এদের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যা স্থানীয়ভাবে প্যারাবন নামেও পরিচিত। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবস্থানও বাংলাদেশে; পাশাপাশি সেন্ট মার্টিনের চারপাশেও রয়েছে প্রবাল প্রতিবেশ (কোরাল ইকোসিস্টেম)।

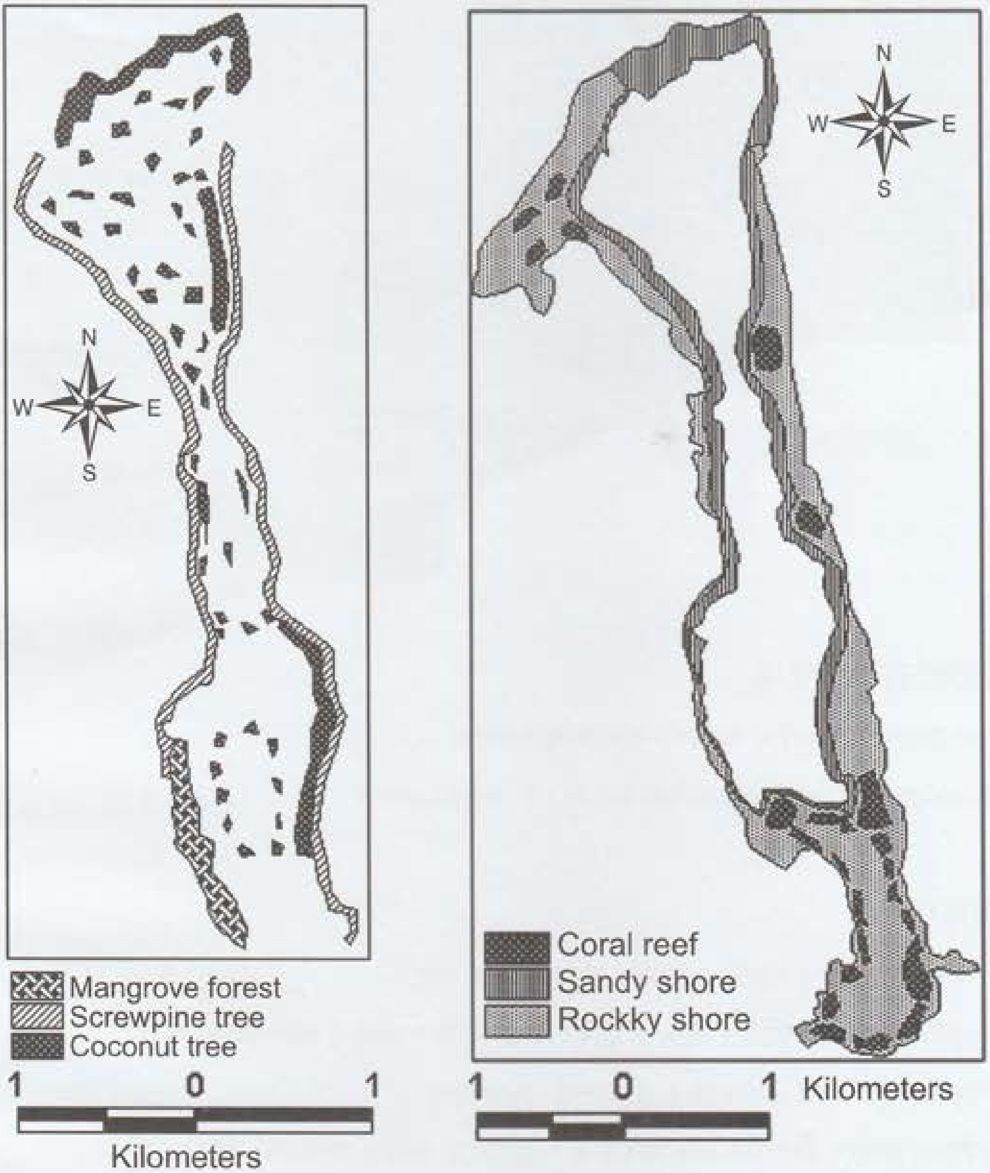

ল্যান্ডসেট টি. এম স্যাটেলাইট ছবির বিশ্লেষণ অনুযায়ী
সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রবাল প্রতিবেশের অবস্থান

আলোচ্য বিষয় - ২

আলোচ্য বিষয়-২

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থতা

Disaster risk in the coastal areas of Bangladesh

উদ্দেশ্য

উপকূলীয় অঞ্চলের আপদ ও দুর্যোগ সমুহ চিহ্নিত করা।

উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা চিহ্নিত করা ও তার কারণ অনুসন্ধান।

উপকূলীয় দুর্যোগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা।

দুর্যোগের কারণে সংঘটিত অর্থনৈতিক ও পরিবেশীয় ক্ষতির ব্যাপকতা সম্পর্কে জানা।

বিষয়বস্তু

উপকূলীয় জীবনযাত্রার ঝুঁকি।

সাইক্লোন ও বাংলাদেশের উপকূল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : সাইক্লোন ও সাইক্লোন জনিত ক্ষতি।

মূল আলোচনা

ভৌগোলিক অবস্থান ও জীব বৈচিত্র্যের নিরীখে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, উপকূলীয় অঞ্চল সমূহের প্রতিবেশ সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। এর একদিকে যেমন রয়েছে অপার সম্ভাবনা অন্যদিকে তেমনি রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণতা ও বিপদসংকুলতা। গত কয়েক দশকে মনুষ্য সৃষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশেষ করে পৃথিবীর বারীমন্ডল ও জীবমন্ডলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দূষণের ফলে সৃষ্ট আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন এ ঝুঁকিপূর্ণতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ও উন্মুক্ত উপকূলভাগ, উপকূলীয় ভাঙন ও পলিসঞ্চায়নের গতিময়তা ও বৈচিত্র্য, সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢালুময়তা ইত্যাদি যেগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics-BBS) কর্তৃক সম্পন্ন দারিদ্র পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা অনুসারে উপকূলীয় দরিদ্র অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ঝুঁকিপ্রবণ হয়ে ওঠার পেছনে যে বিষয়গুলো প্রধান সেগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিক্ষয়, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি অন্যতম।

পাশাপাশি রয়েছে মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ; যেমন ব্যাপক হারে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, ভূগর্ভস্থ পানিতে উচ্চ আর্সেনিকের উপস্থিতি, নানা মাত্রার দূষণ, উপকূলীয় অঞ্চলে উচ্চ মাত্রার লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটানো, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ইত্যাদি। Integrated Coastal Zone Management ICZM এর গবেষণা অনুসারে উপকূলীয় ঝুঁকির ৫৮ শতাংশই মানব-সৃষ্ট কর্মকান্ডের ফল। এ সমস্ত মানব-সৃষ্ট কর্মকান্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠনের প্রবণতা, দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা ও তীব্রতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্থতা উত্তোরোত্তর বাড়ছে, ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, বিলম্বিত করছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

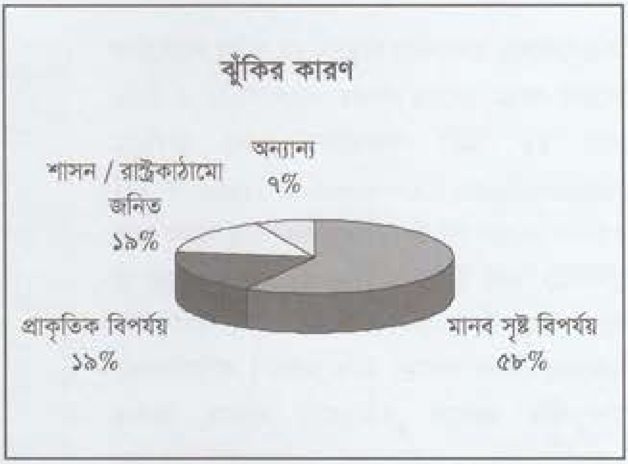

সাইক্লোন ও বাংলাদেশের উপকূল

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলভাগ প্রচন্ড ঝড় ও ক্রান্তিয় সাইক্লোন (Tropical Cyclone) প্রবণ। সারাবিশ্বে সৃষ্ট ক্রান্তিয় সাইক্লোনের মাত্র ১০ ভাগ দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে সংগঠিত হলেও এগুলো সবচেয়ে মারাত্মক ও প্রাণঘাতী। এগুলো বিশ্বের মোট সাইক্লোন জনিত ক্ষতির ৮৫% এখানে করে থাকে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা ও তীব্রতার বিপরীতে আমাদের দুর্যোগ

প্রস্তুতির অপ্রতুলতা ও দুর্বল অবকাঠামো। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের অগভীর ও মৃদু ঢাল, নিচু ও সমতল উপকূলভাগ, বিস্তীর্ণ ও উন্মুক্ত তটরেখা ইত্যাদির ফলে মধ্যম ধরনের সামুদ্রিক ঘুর্ণিপ্রবাহও প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে।

এ ধরণের ক্রান্তিয় সাইক্লোন সাধারণত নিম্নলিখিত অনুকূল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোর যুগপৎ উপস্থিতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে

- পর্যাপ্ত পরিসরে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা; কমপক্ষে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে হবে। যাতে করে উপরিস্থিত বাতাসে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে,
- শক্তিশালী উলম্ব বাতাসের অনুপস্থিতি অথবা নিম্নচাপ এলাকার উপস্থিতি,
- যথেষ্ট পরিমাণ কোরিওলিস শক্তির (পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত কারণে যে শক্তি উৎপন্ন হয়) উপস্থিতি।

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সাইক্লোনের তীব্রতানুসারে শ্রেণী বিভাগ

ক. লো প্রেসার সিস্টেম : বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ২৭ কিলোমিটার/ঘন্টা

খ. ডিপ্রেসান বা নিম্নচাপ: বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ৫৯ কিলোমিটার/ঘন্টা

গ. সাইক্লোন: বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১৩ কিলোমিটার/ঘন্টা

ঘ. প্রবল / মারাত্মক সাইক্লোন : বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১৩ কিলোমিটার/ঘন্টার বেশি।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে যে সমস্ত সাইক্লোন আঘাত হানে এগুলো ভারত মহাসাগরের ৫ ডিগ্রি হতে ১০ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত "International Convergence Zone" এ সৃষ্টি হয়। এ অঞ্চলে সৃষ্ট নিম্নচাপ পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়ে বায়ুপ্রবাহের দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৬-৯ কিলোমিটার উপর দিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন আঘাত হানার বাৎসরিক বিস্তরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মৌসুমি পূর্ব ও মৌসুমি উত্তর ঋতুতে অর্থাৎ এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর - ডিসেম্বর মাসে সর্বাধিক সংখ্যক সাইক্লোন আঘাত হেনেছে। ১৮৮১-১৯৯০ এই ১০০ বছরে সৃষ্ট ছোট বড় প্রায় ৭০০টি সাইক্লোনের মধ্যে ৬২টি মৌসুমি পূর্ব এবং ১৯২টি সাইক্লোন মৌসুমি উত্তর ঋতুতে সৃষ্টি হয়েছে।

সাইক্লোন ১৯৭০

তারিখ: ১২ নভেম্বর

ব্যাপ্তি: ১৫ ঘন্টা

গতিবেগ: ১৯৬ কিলোমিটার/ঘন্টা

স্থায়ী জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা: ৪.৫-৬ মিটার

মৃতের সংখ্যা: ৩ লক্ষ (সরকারি), ১২ লক্ষ (তৎকালীন সংবাদ মাধ্যম অনুসারে)

অনুমিত ক্ষতি: ৮৬.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

- সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস
- ফসলী জমিতে লবণাক্ত পানি ঢোকার ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস।

আবার ১৭৯৩ হতে ১৯৯৭ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের উপকূলভাগে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে এমন সাইক্লোনের সংখ্যা ৪৫টি। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৪-৫ বছর অন্তর বাংলাদেশ ধ্বংসাত্মক সাইক্লোনে আক্রান্ত হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ সাইক্লোন ১৯৭০, ১৯৯১

১৯৭০ এর সাইক্লোনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির অন্যতম কারণ হিসেবে যে সমস্ত বিষয় বিবেচিত হয়েছিল, সেগুলো হলো-

- উপকূলীয় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বেড়ি বাঁধ না থাকা
- সাইক্লোনের প্রাক্কালে পর্যাপ্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা না থাকা

১৯৭০ এর সাইক্লোনে ব্যাপক ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতার আলোকে এবং উপকূলীয় জেলাগুলোকে ধ্বংসযজ্ঞ হতে রক্ষার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে বেড়িবাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি সাইক্লোন পর্যবেক্ষণ ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ইত্যাদিও আধুনিকীকরণ করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল, এর ফলে অন্তত ব্যাপক প্রাণহানী ও অর্থনৈতিক ক্ষতি এড়ানো যাবে। কিন্তু ১৯৯১ এর প্রলয়ঙ্কারী সাইক্লোন তা ভুল প্রমাণিত করে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে যে সাইক্লোনটি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে তা ছিল স্মরণকালের ভয়াবহতম। সাইক্লোনটি আকৃতিতে প্রায় বাংলাদেশের দ্বিগুণ এবং ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে মেঘের আয়তন ছিল ৬০০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি।

সাইক্লোন ১৯৯১

তারিখ ঃ ২৯ এপ্রিল

গতিবেগ : ২২৫ কিলোমিটার সর্বোচ্চ ২৪০ কিলোমিটার (NOAA-11) এর স্যাটেলাইট ইমেজ অনুসারে)

জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা : ৬-১০ মিটার

মৃতের সংখ্যা : ১,৩৮,০০০ সরকারি

অনুমিত ক্ষতি : ১৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

- ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি
- ফসলী জমিতে লবণাক্ত পানি ঢোকার ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস।

দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয় এমন পাঁচটি ক্ষেত্র ঃ

- জীবিকা
- বাসস্থান
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- স্বাস্থ্য
- উদ্ভিদ ও প্রাণ সম্পদ

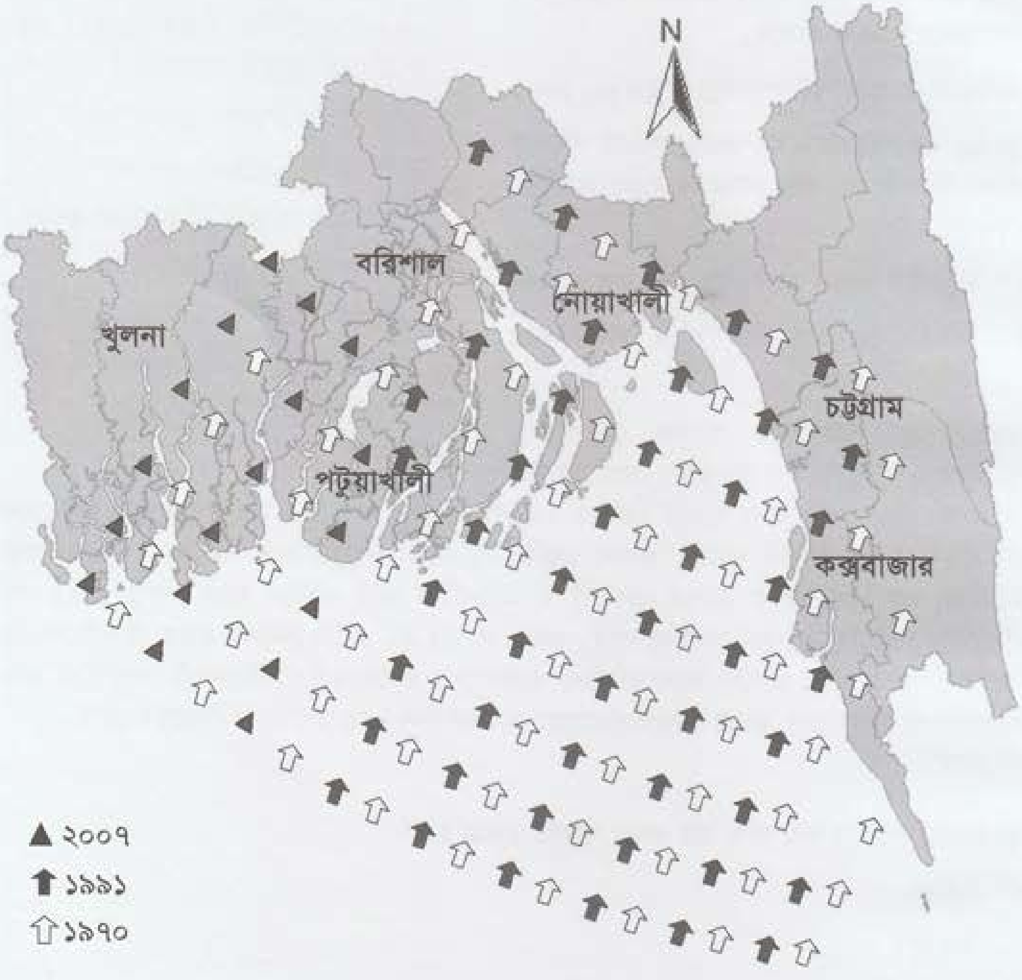

১৯৭০, ১৯৯১ ও ২০০৭ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্গত এলাকা

আলোচ্য বিষয় - ৩

আলোচ্য বিষয়-৩

দুর্যোগ, ঝুঁকি, আপদ ও বিপদগ্রস্থতার সম্পর্ক

Relationship among Disaster, Risk, Hazard, and Vulnerability

উদ্দেশ্য

দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে জানা।

ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল বিষয়ে পর্যালোচনা।

আপদ, ঝুঁকি, দুর্যোগ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা।

সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল সম্পর্কে জানা।

বিষয়বস্তু

আপদ, ঝুঁকি, দুর্যোগ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা।

বিপদাপন্নতা হ্রাস।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয়াবলী।

মূল আলোচনা

ঝুঁকি (Risk) ঃ
কোন আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ-এই তিন উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ার কারণে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনা। অর্থাৎ সহজে বললে কোন আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভাবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি।

আপদ (Hazard) ঃ
আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানব সৃষ্ট বা কারিগরী ক্রটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

প্রাকৃতিক - সাইক্লোন, বন্যা, ভুমিকম্প, সুনামী, খরা, নদীভাঙ্গন

মানব সৃষ্ট - ভবন ধ্বংস, নৌ-দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড

কারিগরী - পারমানবিক দুর্ঘটনা

দুর্যোগ (Disaster) ঃ
দুর্যোগ হলো প্রকৃতি বা মানুষের সৃষ্ট বা সংঘঠিত এমন ঘটনা যা চলমান সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করতে হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এত বেশী হয় যা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রায়ই পূরণ করা সম্ভব হয় না, বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

আপদ দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ ঃ

ভূমিকম্প একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানীসহ ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। মৃদু ভূ-কম্পন আপদ কিন্তু এতে দুর্যোগ দেখা দেয় না।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability) ঃ
কোন জনগোষ্ঠি বা তার অংশ কোন সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং উক্ত আপদের প্রভাব অথবা কোন আপদের বৈশিষ্ট্য সমূহের হুমকীর মুখে টিকে থাকার ক্ষমতা ন্যূনতম পর্যায়ে থাকা।

সামর্থ্য (Capacity) ঃ
সামর্থ্য হচ্ছে সত্যিকার অথবা সম্ভাব্য কোন দুর্যোগে উক্ত জনগোষ্ঠির ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেবার শক্তি।

ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা

ঝুঁকি = আপদ × বিপদাপন্নতা / সক্ষমতা

ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল : সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিপদাপন্নতা হ্রাস

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমাদের করণীয় ঃ

উপকূলীয় জীবনযাত্রায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ঝুঁকির দায়ভাগ ১৯% হলেও মানব সৃষ্ট বিপর্যয় ও দেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এ ঝুঁকির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি উন্নয়নের পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ঝুঁকি বৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সামাজিক - অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সম্মিলিত প্রভাব :

প্রধান কারণ	নিয়ত চাপ	অনিরাপদ ব্যবস্থা	দুর্যোগ	বিপর্যয়
ক্ষমতা কাঠামো ও সম্পদে অপ্রতুল অভিগম্যতা আদর্শগত অবস্থান রাজনৈতিক অবস্থান অর্থনৈতিক অবস্থান	স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্থানীয় বিনিয়োগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ইত্যাদির অভাব দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নগরায়ন প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক দায়দেনা পরিশোধের চাপ বন ধ্বংস জমির উর্বরতা কমে যাওয়া	দুর্বল অবকাঠামো দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি ঝুঁকিগ্রস্থ সমাজ যেমন আদিবাসী, দ্বীপবাসী, জেলে সম্প্রদায় অপর্যাপ্ত দুর্যোগ প্রস্তুতি মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব	ঝুঁকি = প্রাকৃতিক বিপর্যয় + সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্থতা	সাইক্লোন বন্যা ভূমিকম্প ভূমিধ্বংস অগ্নুৎপাত খরা তাপদাহ রোগের প্রাদুর্ভাব

এক্ষেত্রে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা উন্নয়ন একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সক্ষমতা যত বাড়বে ঝুঁকি তত কমবে। সক্ষমতা ও ঝুঁকি বিপরীতক্রমে সম্পর্কিত-

Cv = Hr : High Capacity, Less Vulnerability, Less Risk
cV = HR : Less Capacity, High Vulenrablity, High Risk

H, Hazard Remains Constant

স্থায়িত্বশীলভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন;

স্থানীয় পর্যায়ে

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- স্থানীয় ভাষায় এবং সহজ অর্থে দুর্যোগ বার্তা প্রেরণ
- ম্যানগ্রোভ বনায়ন ও প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন; যেমন সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও পর্যালোচনা বৃদ্ধি
- কমিউনিটি ভিত্তিক রেডিও কার্যক্রম চালু

জাতীয় পর্যায়ে

- গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রসার যাতে নগরায়ন প্রক্রিয়া হ্রাস পায়
- দুর্যোগ প্রতিরক্ষা ও পুনর্বাসন কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো।
- ম্যানগ্রোভ ধ্বংস বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া
- লবণাক্ততা উপযোগী ধানের/ফসলের বীজের উন্নয়ন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- পরিবেশ বিধ্বংসী দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ পরিহার যেমন-সিমেন্ট, ইটখোলা, জাহাজভাঙ্গা শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা যেমন আদিবাসী ও জেলে সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ
- একক প্রজাতির বৃক্ষের বনায়নের পরিবর্তে উপকূলীয় দুর্যোগে সহায়তাকারী বৃক্ষ যেমন নারিকেল, তাল, সুপারি, বাঁশ ঝাড় ইত্যাদির বনায়ন বৃদ্ধি
- কৃষিতে হাইব্রিড, GMO (Genetically Modified Organism) এর প্রবর্তন হ্রাস সহ অতি মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ বন্ধ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

- দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ অঞ্চলে Adaptation সহযোগিতা বাড়ানো
- গ্রীণ হাউস গ্যাসের নিঃসরনের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এমন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে Alliance গঠন ও শিল্পোন্নত দেশ সমুহকে GHG (Green House Gas) নিঃসরণ কমাতে চাপ প্রদান।
- বিশ্বের কার্বন বাণিজ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

আলোচ্য বিষয় - ৪

আলোচ্য বিষয়-৪

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা

Role of mangrove forest in disaster risk reduction

উদ্দেশ্য

ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের বিস্তরণ সম্পর্কে জানা।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা পর্যালোচনা।

বিষয়বস্তু

ম্যানগ্রোভ

জীব প্রতিরক্ষা ঢাল হিসাবে ম্যানগ্রোভ

দুর্যোগ হতে রক্ষায় ম্যানগ্রোভের ভূমিকা।

মূল আলোচনা ঃ

ম্যানগ্রোভ (প্যারাবন) কি?

উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের গাছ (যেমন সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া ইত্যাদি) ও গুল্মের সমন্বয়ে যে বন গড়ে উঠে তাকে ম্যানগ্রোভ (প্যারাবন) বা উপকূলীয় বনাঞ্চল বলে। ইংরেজীতে এ বনাঞ্চলকে Mangrove Forest বলা হয়ে থাকে। প্রায় ১৬টি পরিবারের ৪০-৫০টি প্রজাতি ম্যানগ্রোভের অন্তর্ভূক্ত।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ ঝুঁকি হতে রক্ষার পাশাপাশি জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার যোগান দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ঢাল হিসেবে ম্যানগ্রোভ বেষ্টনি সুনামি ও টাইফুনের তীব্রতা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত প্রশমন করতে সক্ষম। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ প্রলয়ংকারী সুনামির থাবায় থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকায় প্রাণ হারায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার মানুষ এবং প্রায় ১০ হাজার ভবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অথচ থাইল্যান্ডের র‍্যানং এলাকা প্রায় দুর্যোগমুক্ত থেকে যায় এর তীরবর্তী গভীর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রতিরোধের কারণে। ২০০৫ সালে শ্রীলংকার কেপুহেনওয়ালা গ্রামে আইইউসিএন কর্তৃক পরিচালিত ইকনোমিক হাউজহোল্ড সার্ভে-তে দেখানো হয় যে প্রতি হেক্টরে গড়ে ওঠা সুনিবিড় ম্যানগ্রোভ বন হতে প্রায় ১৪,০০০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা অর্জন করা সম্ভব।

আইইউসিএন-কলম্বোর এর আঞ্চলিক ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুড গ্রুপের প্রধান অর্থনীতিবিদ লুসি এমার্টন এর মতে, "ম্যানগ্রোভ মৎস্যজীবি ও পর্যটনের মতো সেক্টরে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেশগত সহায়তা দেয় যা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রহরীর মতো কাজ করে। পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।"

জীব প্রতিরক্ষা ঢাল হিসেবে ম্যানগ্রোভ ঃ পৃথিবী রক্ষার দৃষ্টান্ত

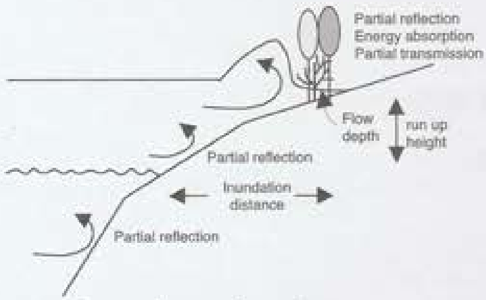

প্রাকৃতিক দূর্যোগে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক

ম্যানগ্রোভ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক

টর্ণেডো, সাইক্লোন ও সামুদ্রিক ঢেউ প্রতিরোধে ম্যানগ্রোভের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত।

ম্যানগ্রোভের মূল-কান্ড শাখা-প্রশাখা বায়ুপ্রবাহ, সামুদ্রিক ঢেউ ও জোয়ারের স্রোতকে দুর্বল করে দেয়।

ম্যানগ্রোভের উপস্থিতি মানুষ, ঘরবাড়ী ও গবাদিপশুর ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে দেয়।

গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যেমন দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে; আবার এই প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন দুর্যোগ প্রবণতা ও তার ক্ষতির মাত্রা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। যেমন:

- ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে সংঘটিত সুনামির পূর্বেই বন উজারীকরণের সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।
- হাইতিতে ২০০৬ সালের মে মাসের ব্যাপক বন্যা এবং সেপ্টেম্বরে বিষুবীয় ঝড় জিনি মিলে ৫০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটায়। গণমাধ্যম এবং বিজ্ঞানীরা তাৎক্ষনিকভাবে এজন্য বন উজারীকরণকে দায়ী করেন, যেখানে ৯৮ শতাংশ বন উজার করা হয়েছিল। ফিলিপাইনে ২০০৫'র নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে বন্যা এবং ভূমিধসে ১৬০০ লোক নিহত অথবা নিখোঁজ হয়। প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া আরোয়া এই দুর্যোগের জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। বিরামহীন বন উজার করার কারণে বর্তমানে সে দেশে ৬ শতাংশ'র কম বন অবশিষ্ট রয়েছে।

সুনামিতে প্রাণ রক্ষা করল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল

মঙ্গলবার, ২০ ডিসেম্বর ২০০৫, সকাল ৯:৪২

প্রেস রিলিজ : জাতিসংঘ

ব্যাংকক, থাইল্যান্ড কলোম্ব, শ্রীলংকা, ১৯ ডিসেম্বর (আইইউসিএন): ডিসেম্বর ২০০৪ এ এশিয়ায় আঘাত হানা সুনামি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানি ঘটায়। সেইসাথে এও প্রকাশিত হয় যে, গত দশকে উপকূলীয় প্রতিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ধ্বংস হওয়ার ফলে জলোচ্ছ্বাসের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবটি পড়েছে এ সময়।

সাধারন জলচ্ছ্বাসের তীব্রতা বা শক্তির ৭০-৯০ শতাংশ প্রশমন করতে পারে ম্যানগ্রোভ, যদিও সুনামির ক্ষেত্রে এর সঠিকমাত্রাটা জানা যায়নি। দক্ষিন শ্রীলংকায় লেগুনের মধ্যে থাকা কেপুহেনওয়ালা এবং ওয়ানদুরুপ্পা এই দু'টি গ্রামের জনসাধারণের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব আবারও প্রমাণিত হয়েছে। ২০০ হেক্টরের ঘন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বেষ্টিত কেপুহেনওয়ালাতে সুনামি মাত্র ২ জনের প্রাণ নিতে পেরেছে-শ্রীলংকায় সুনামিতে সবচেয়ে কম প্রাণহানির ঘটনা এটাই। অন্যদিকে পুরো জেলায় মোট ৬০০০ নিহতের মধ্যে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম ওয়ানদুরুপ্পাতেই প্রাণহানি ঘটে ৫০০০।

- ১৯৯৯ অক্টোবরে ভারতের উড়িষ্যা উপকূলে আঘাত হানা শক্তিশালী সাইক্লোনের তান্ডবের সাথে বন উজারের বিষয়টি সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই সাইক্লোনে বেশিরভাগ ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপকভাবে বন উজারকৃত নতুন বসতি এলাকা উরিষ্যা উপকূলে যেখানে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধন করা হয়। বৃক্ষহীন ঐ উপকূলে আঘাত হানা সাইক্লোন ও সাইক্লোনজনিত জলোচ্ছ্বাসে কয়েক মিনিটে সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে।
- স্থানীয় প্রতিবেদন বলা হয়, অবৈধ অভিবাসীদেরকে ভোটগ্রাসী রাজনীতিকরা বাছ বিচারহীনভাবে উপদ্রুত এলাকায় থাকতে সাহস জুগিয়েছিল। সেখানে তারা ঘরবাড়ি নির্মাণের সময় ব্যাপকভাবে বালিয়াড়ি আর ক্যাজুয়ারিনা জাতীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস করে, যেগুলো কার্যকরভাবে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়োবাতাস প্রতিরোধ করত।

- অন্যদিকে, সাইক্লোন-প্রবণ ভিয়েতনামের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে সরাসরি সুবিধা পেয়ে আসছে। দেশটিতে ১৯৯৪ সালের পর থেকে রেড ক্রসের ভিয়েতনাম ন্যাশনাল চ্যাপ্টার স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বৃদ্ধির কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২ হাজার হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন করা হয়, আর এর ফলাফলও খুবই পরিষ্কার। ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য ১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ উপকূলীয় বাঁধ রক্ষনাবেক্ষণের আনুমানিক বার্ষিক খরচ ৭.৩ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে। উল্লেখিত এলাকায় ২০০০ সালের প্রলয়ংকারী টাইফুন উকং আঘাত হানলেও প্রকল্প এলাকা প্রায় কোন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সুরক্ষিত থেকে যায়, যেখানে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ব্যাপক প্রাণ সম্পদ ও প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের বিস্তরণ

পৃথিবীর বেশির ভাগ বিষুবীয় দেশেই প্রকৃতিগতভাবেই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের উপস্থিতি ও বিস্তরণ লক্ষ্যণীয়। ম্যানগ্রোভ বিস্তরণের জন্য ৫টি পরিবেশীয় প্রভাবকের উপস্থিতির আবশ্যকতা রয়েছে: (১) বিষুবীয় তাপমাত্রা, (২) সুক্ষ্ম অ্যালুভিয়াম (৩) বড় বড় ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাসমুক্ত উপকূলীয় অঞ্চল (৪) লবণাক্ত পানি এবং (৫) বৃহৎ স্রোত সীমা।

এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় প্রভাবক ম্যানগ্রোভের বিস্তার ও আকার, এবং সেই সাথে প্রজাতির বিন্যাস ও অন্যান্য গঠনগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ম্যানগ্রোভ বিস্তরণে সহায়ক উল্লেখিত ৫টি পরিবেশীয় প্রভাবকের দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রকৃতিগতভাবেই গড়ে উঠেছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ও এর সাথে সাথে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ প্রাণীজগত।

এই সংরক্ষিত প্রাণবৈচিত্র্য এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এখন অনধিকার প্রবেশ ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের কারণে ধ্বংসের মুখে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর ম্যানগ্রোভ বানঞ্চল রয়েছে; এরমধ্যে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ অঞ্চল ০.৬০ মিলিয়ন হেক্টর ও বনায়নকৃত ম্যানগ্রোভ ০.১৩ মিলিয়ন হেক্টর।

বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ অঞ্চল

সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ যা খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। এছাড়াও ভোলা, নোয়াখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ফেনী, মিরসরাই, সীতাকুন্ড, কাট্টলী, চকোরিয়া কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার ও টেকনাফ উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের উপস্থিতি দেখা যায়।

বনের শ্রেণীবিভাগ	এলাকা (মিঃ হেঃ)	শতকরা হার
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ	০.৬০	৭৮.৩৪
বনায়নকৃত ম্যানগ্রোভ	০.১৩	২১.৬৬
মোট	০.৭৩	

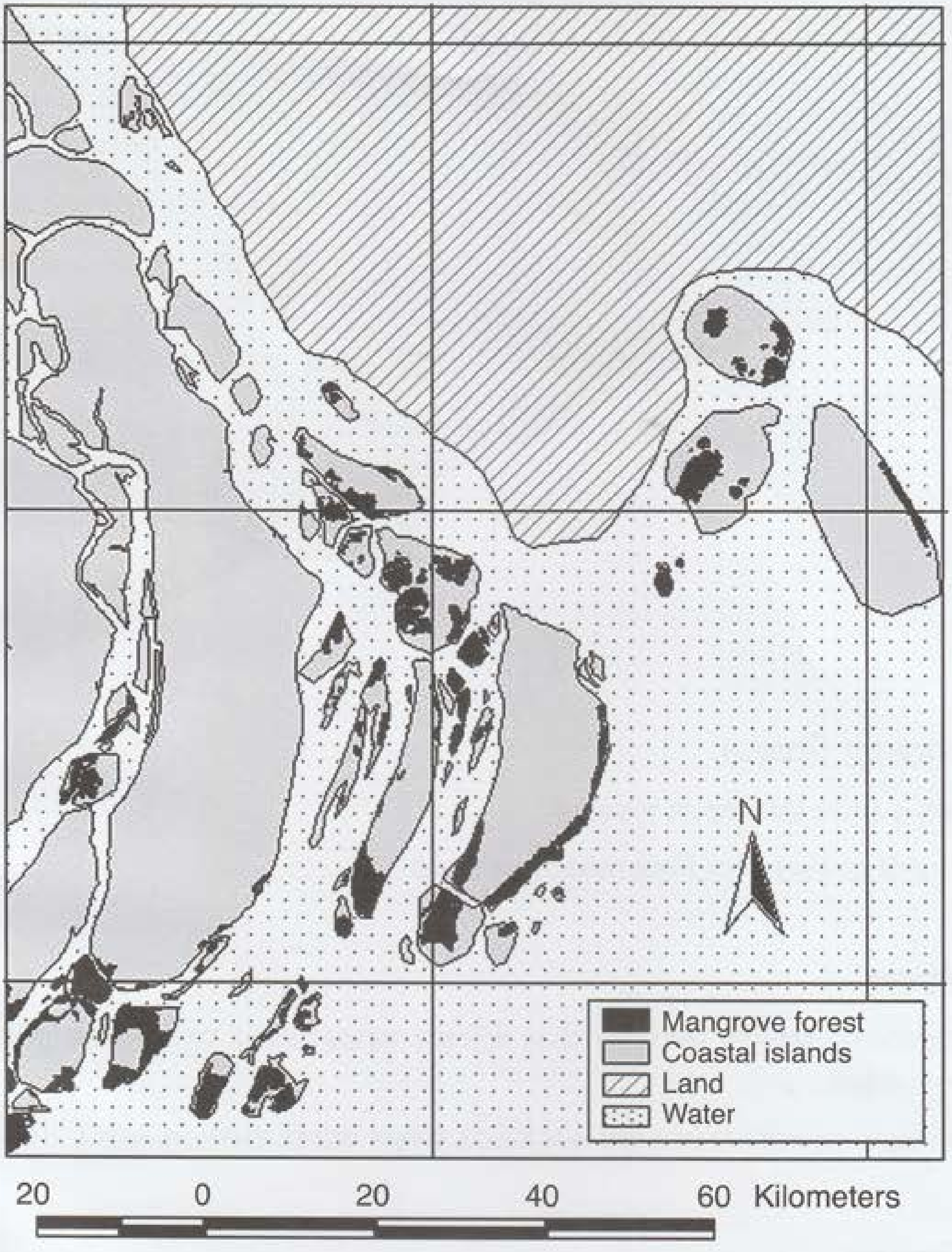

২০০৭ সালের ল্যান্ডসেট টিএম স্যাটেলাইট ছবির বিশ্লেষণ অনুযায়ী
বাংলাদেশের মেঘনা অঞ্চলীয় দ্বীপ সমূহে ম্যানগ্রোভের বিস্তৃতি

আলোচ্য বিষয় - ৫

আলোচ্য বিষয়-৫

পণ্য ও সেবার উৎস হিসেবে ম্যানগ্রোভ

Goods and services from mangrove forest

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার সহায়ক হিসেবে ম্যানগ্রোভ-এর ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সংরক্ষণ মূল্য ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণগুলো জানা।

বিষয়বস্তু

ম্যানগ্রোভ ও জন জীবন জীবিকা

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ।

মূল আলোচনা ঃ

ম্যানগ্রোভ ও জন জীবনজীবিকা

বস্তুত ম্যানগ্রোভ একটি লাভজনক প্রতিবেশ। কারণ ম্যানগ্রোভের সামাজিক ও প্রতিবেশগত মূল্য অপরিসীম। ম্যানগ্রোভের বাৎসরিক অর্থনৈতিক মূল্য ধরা হয় এর উৎপাদন ও সেবার মূল্যমান দ্বারা, যা হেক্টর প্রতি প্রায় ২ থেকে ৯ লাখ মার্কিন ডলার। ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জলজপ্রাণী যেমন মোলাস্ক, কাঁকড়া-চিংড়ি ইত্যাদির সমৃদ্ধ আবাসস্থল।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের এক অসাধারণ পরিবেশগত সমন্বয়। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অন্যান্য সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- অনেক ম্যানগ্রোভের ঔষধি গুণ রয়েছে
- ম্যানগ্রোভ উপকূল / তটরেখা বরাবর বংশবিস্তার করে এবং ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস এবং পলি ক্ষয় থেকে উপকূলবর্তী এলাকাকে রক্ষা করে
- ম্যানগ্রোভ উইন্ড ব্রেকার হিসেবে কাজ করে বলে সাইক্লোনের তীব্রতা কমিয়ে দিতে পারে।
- এছাড়াও ম্যানগ্রোভ ঘর-বাড়ি ও নৌকা তৈরীর উপকরণ সরবরাহ, জ্বালানী কাঠ সরবরাহ ও মধুর যোগান দেয়।

ম্যানগ্রোভের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উপকারিতা নীচের ছকে দেখানো হল:

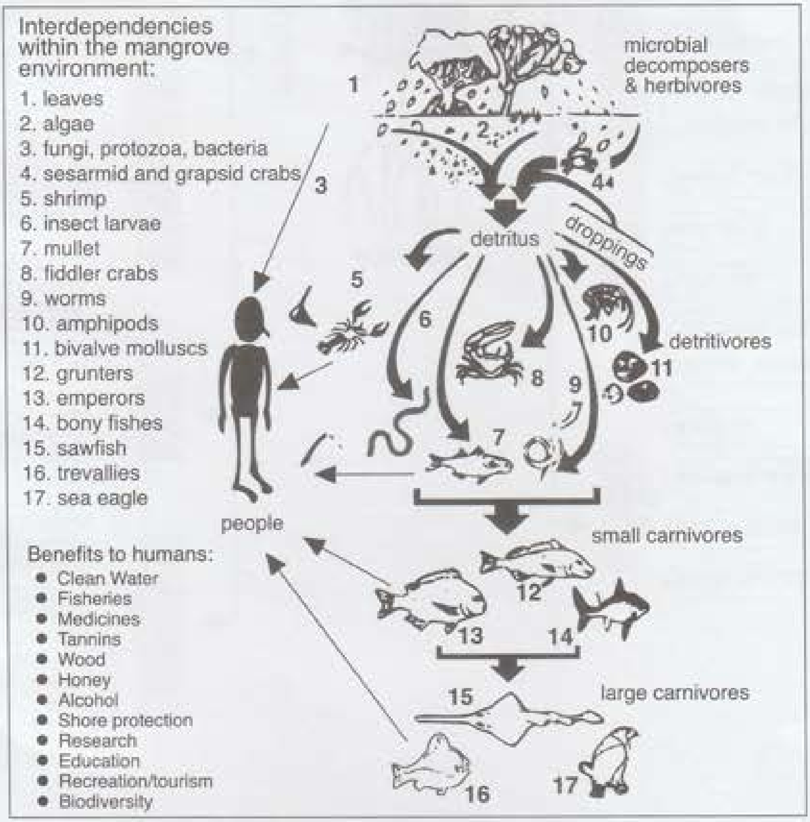

পণ্য ও সেবার অপূর্ব উৎস ম্যানগ্রোভ

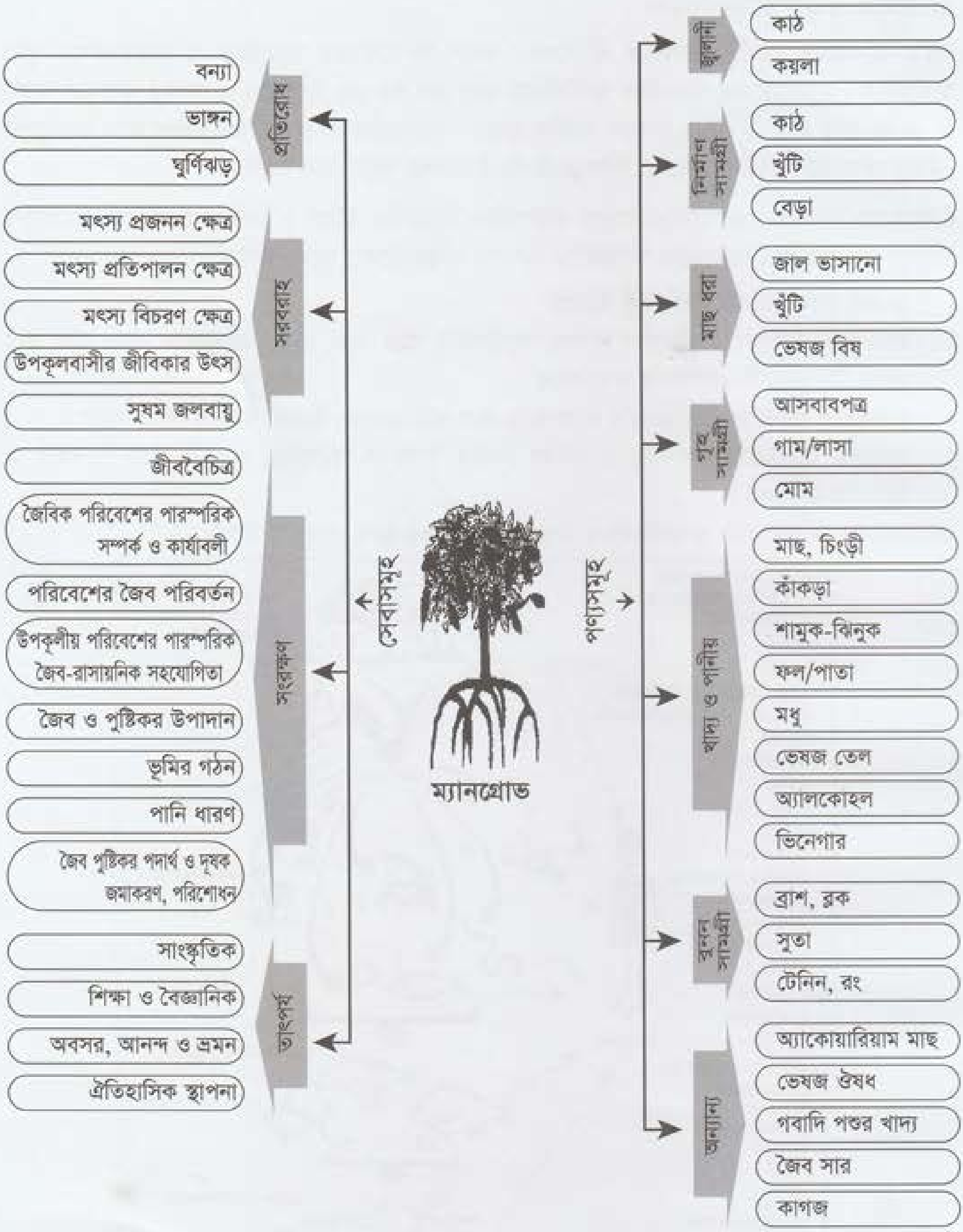

- ম্যানগ্রোভ মাটিতে পুষ্টি উপাদানের সংযোজন ও সংরক্ষণ করে এবং বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড সংবদ্ধ (CO_2 Fixation) করে রাখে। এটি বায়ু এবং পানি থেকে দূষক পদার্থ শোষণ করে ব্যাপক মাত্রার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যানগ্রোভের পাতা ও বাকলে উচ্চমাত্রায় ট্যানিনের (Tannin) উপস্থিত রয়েছে যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্প-দূষণ প্রশমনে কাজ করে।
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল অনেক লবণাক্ত পানির প্রাণী, বিশেষ করে উচ্চ অর্থনৈতিক মুল্যামানের মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারের অত্যন্ত উত্তম আশ্রম। এ বনাঞ্চলের মৌচাক থেকে মধু এবং মোম সংগ্রহ করা হয়।
- সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী প্রজাতির অভয়াশ্রম।
- সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬০০০ t/ha ম্যানগ্রোভ লিটার উৎপন্ন হয়। এই বিপুল পরিমাণ লিটার প্রাকৃতিকভাবেই ডি-মিনারেলাইজেশন (De-mineralization) প্রক্রিয়ায় ভেঙে উপকূলীয় মাটি ও পানিতে প্রচুর পরিমাণে জৈবিক পুষ্টি উপাদান সংযুক্ত করে।
- অনেক ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র, নৌকা ও জলযান তৈরি এবং জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
- সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসহ বহুমাত্রিক আন্তঃবিষয়ক গবেষণা কর্মসূচির সুযোগ করে দিয়েছে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের পুনঃসঞ্চার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ইকোট্যুরিজম, বায়োলজিক্যাল রিসার্চ, সংরক্ষণ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সুবিধার সুযোগ বয়ে আনতে পারে।
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বন্দরের নোঙর করা জাহাজ থেকে পরিত্যাক্ত তৈলবর্জ্য এবং উপকূলীয় জলে নিঃসরিত অন্যান্য দূষণ উপকরণ শোষণ করে এবং পানিকে কম ক্ষতিকর মাত্রায় রাখে।

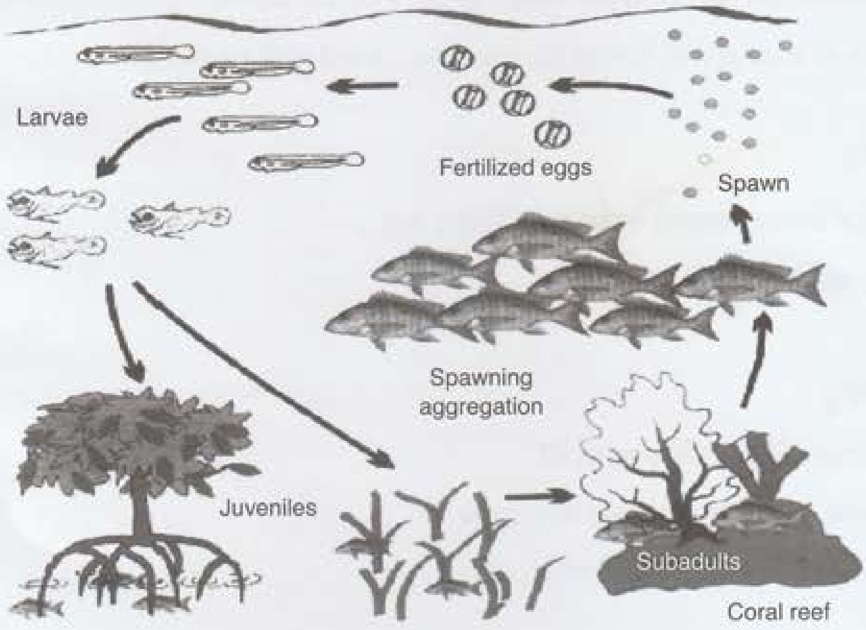

আলোচ্য বিষয় - ৬

আলোচ্য বিষয়-৬

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ সমূহ : স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

Casues of mangrove forest destruction : local and global perspective

উদ্দেশ্য

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণ সমূহ চিহ্নিত করা।

বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণগুলো জানা।

বিষয়বস্তু

ম্যানগ্রোভের ঝুঁকি ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জন্য হুমকি

চকরিয়া সুন্দরবন ধ্বংসের ক্রমবিবর্তন।

ম্যানগ্রোভের ঝুঁকি ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

যদিও ম্যানগ্রোভ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় সুরক্ষা ঢাল হিসেবে কাজ করে তথাপিও বিভিন্ন অস্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে পৃথিবীব্যাপী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল আশঙ্কাজনক হারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। গত ৫০ বছরে পৃথিবীর মোট ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন মানবসৃষ্ট কারণে বিলীন হয়েছে। অনুমান করা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০২৫ সালের মধ্যে আরো ২৫ শতাংশ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে। ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশ, যেখানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সুনিবিড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে, সেখানেও ব্যাপকহারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করা হচ্ছে। দেশটির কোন কোন স্থানে যেমন জাভা বা সুমাত্রা দ্বীপে এ ধ্বংসের হার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের মানবসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা বনজ সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার, বনভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তর, বনভূমিকে চিংড়ি চাষের ঘেরে রূপান্তর এবং এতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের সবচেয়ে বড় মানবসৃষ্ট হুমকিটি হচ্ছে চিংড়ি চাষের পুকুর ও ঘের স্থাপন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে পতিতভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেগুলোকে কৃষিজমি অথবা চিংড়ি ঘের হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। বস্তুত চিংড়ি চাষ পৃথিবীব্যাপী ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের জন্য দায়ী।

মানবসৃষ্ট এইসব কারণের পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হুমকির সম্মুখীন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Hydro-metrological Disaster) সংগঠনের প্রবণতা বাড়ছে। পাশাপাশি বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এবং এগুলো মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডের কারণেই ঘটছে।

বাংলাদেশে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জন্য হুমকি

- ওডিএ (ODA) ইনভেন্টরি রিপোর্টের একটি সারণীতে দেখানো হয়েছে যে, সুন্দরী (Hereteria fomes) গাছের সংখ্যা হ্রাসের বর্তমান হার প্রতি হেক্টরে ১১৪টি গাছ। উল্লেখিত হারে ৩৯৫.৫১৪ হেক্টর বনভূমিতে প্রায় ০.৪৫ মিলিয়ন গাছ ইতিমধ্যে আগা মরা রোগে আক্রান্ত। (সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ : ভলিউম ২ : বাংলাদেশ)।
- কম স্রোতধারা থাকায় বনাঞ্চলের মধ্যে লবণের জমি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে উদ্ভিদের বংশবিস্তার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বনের মাঝখানে বড় বড় শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক জাহাজ, যন্ত্রচালিত নৌকা ও অন্যান্য জাহাজ থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত বর্জ্য প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। (বেঙ্গল টাইগারস ইন বাংলাদেশ সুন্দরবনস, আইইউসিএন)।
- বনভূমি ও পতিত জমির অতিরিক্ত ব্যবহার ও সেখান থেকে বেআইনীভাবে গাছ কাটা এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। এভাবে প্রায় অর্ধেক বনভূমি চাষাবাদ বা অন্য প্রয়োজনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। (ফরেস্ট এন্ড ফরেস্ট্রি সেক্টর, এফএও, বাংলাদেশ)।

- ১৯৮৮ সালের ল্যান্ডসেট টি এম ডাটা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, চকরিয়ার ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পূর্ণভাবে উজাড় করা হয়েছে। ৭৫০০ হেক্টর বনভূমির মধ্যে এখন মাত্র ৯৭৩ হেক্টর বিচ্ছিন্ন ফরেস্টের উপস্থিতি দেখা যায়। সমস্ত বনভূমি এখন চিংড়ি চাষীদের দখলে। (Study of Chokoria Sundarbans using Remote Sensing Technology)
- দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের ৫১ একর ভূমি যা আগে ফরেস্টের আওতায় ছিল তা এখন বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সুপরিকল্পিত আবাসন প্রকল্পের জন্য বনবিভাগের আপত্তি সত্ত্বেও এই ভূমি অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করা হয় (The Daily Star, 22 Feb; 07)।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় এলাকাকে ব্যাপকভাবে হুমকীর সম্মুখীন করতে পারে। এর ফলে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পড়বে। বিজ্ঞানীদের মতে, আগামী ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি বাড়তে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের এ উচ্চতা বৃদ্ধি সুন্দরবনকে তলীয়ে দিতে পারে।

ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের কারণ সমূহ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের কারণসমূহ নীচের ছকে দেখানো হয়েছে।

চকরিয়া সুন্দরবন ধ্বংসের ক্রমবিবর্তন

Mangrove status					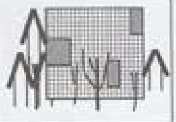
Time	**1903**	**1929**	**1952-1975**	**1977-1988**	**2001**
Activity	Reserved mangrove forest	Allowed human settlement	Human settlement expanded	Shrimp and salt encroachment	The entire mangrove forest altered in shrimp farms with minor salt bed and human settlement

Porteresia coarctata or Myrostachya wightiana *Avenecia spp.* *Excoecaria agollocha*
Sonneratia apetata *Heritera fomes* *Shrimp farm* *Salt bed* *Human Settlement*

আলোচ্য বিষয় - ৭

আলোচ্য বিষয়-৭

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নের উদ্যোগ ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ

Plantation and conservation of mangrove forest in the coastal areas of Bangladesh

উদ্দেশ্য

ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য গৃহিত কর্মসূচীগুলো সম্পর্কে জানা।

ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের জন্য করনীয় বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য উপযুক্ত স্থানগুলো চিহ্নিত করা।

বিষয়বস্তু

ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণে গৃহিত কর্মসূচী

ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকি এড়াতে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ও প্রস্তাবনা।

মূল আলোচনা

ম্যানগ্রোভ বনায়নের উপযুক্ত স্থান

উপকূলীয় এবং মোহনা অঞ্চলের কর্দমাক্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান। নতুন করে সৃষ্টি হওয়া উপকূলীয় চর অঞ্চলে প্রাকৃতিক ঘাস জন্মালে চারা বপনের উপযুক্ততা নির্দেশ করে।

ম্যানগ্রোভ বনায়নে এ পর্যন্ত গৃহিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

- উপকূলীয় অঞ্চলে সরকার ১৯৬০-৬১ সালে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৮০-৮১ সালে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় তা আরো ত্বরান্বিত হয়। ৮৯০০০ একর উপকূলীয় ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হয় (Forestry I Project).
- বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ১৯৮৫-৮৬ সালে দ্বিতীয় পর্বে উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪২৮৩৫ হেক্টর জমি বনায়ন করা হয়েছে।
- ইউএনডিপি'র Wildlife Wing ২০০৪ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ উদ্যোগে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ইকো সিস্টেম সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নের উদ্যোগ

সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারীজ নোয়াখালী উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব গবেষণায় উপকূলবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ভূমি ও জলাশয়ের ব্যবহার, মাছ ও চিংড়ী উৎপাদন, কৃষি, গবাদিপশু পালনসহ ম্যানগ্রোভের ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। সাইক্লোন বা ঘুর্ণিঝড় এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে উপকূলবাসীর জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ম্যানগ্রোভ একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। উক্ত গবেষণালব্দ তথ্য হতে নোয়াখালী সদর ও কোম্পানীগঞ্জ উপকূলে প্যারাবন সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান চিত্রে দেখানো হয়েছে।

সন	ম্যানগ্রোভ বনায়ন : চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকা									মোট (হেক্টরে)
	মীরেশ্বরাই উপকূলীয় এলাকা (হেক্টরে)				সীতাকুন্ড উপকূলীয় এলাকা (হেক্টরে)					
	বামনসুন্দর	উমখালী	ইচাখালী	মগাদিয়া	বগাছাতর	বাকখালী	বাশবাড়িয়া	ভাতেরখালী	কাট্টলী	
১৯৬৭							২৭০			২৭০
১৯৬৮					১০০	১৪০	৪০			২৮০
১৯৬৯					৭০	১২	১৮			১০০
১৯৭০		১০			৯					১৯
১৯৭৩						৫৫	৫			৬০
১৯৭৪						৩১৫	৫			৩২০
১৯৭৫		২৭৫			৩০০	৪০০				৯৭৫
১৯৭৬		৩৭৫			৩৭৫	৫০০	৬৫০			১৯০০
১৯৭৭		৯৫০			৫০০					১৪৫০
১৯৭৮		২০০								২০০
১৯৭৯				১১৫০						১১৫০
১৯৮০	৩৩০	১৫০		৮৫০		২৫০				১৫৮০
১৯৮১	১৭৫			৪২৫		৬০০				১২০০
১৯৮২	১৫০			৪৫০		২০০	৮০০		৬৫০	২২৫০
১৯৮৩	২০০			৩০০			৭০০		৪০০	১৬০০
১৯৮৪	১৫০			২৫০			৬২০		৭০০	১৭২০
১৯৮৫	৪৫০	৫০	১০০	৪০০						১০০০
১৯৮৬			৮০০							৮০০
১৯৮৭	২৪০		১৫৬০	২০০						২০০০
১৯৮৮	২০০		৯০০	৪০০			১০০		২০০	১৮০০
১৯৮৯			২৫০				১২৫		৪০০	৭৭৫
১৯৯১	৫০		১৫০	১২০					২০০	৫২০
১৯৯২	২০০					২০		৫৪.৫৯	৬০.৭৩	৩৩৫.৩২
১৯৯৩	৫০			২০১					২৩.২৫	২৭৪.২৫
১৯৯৭	৩০০		১২৩.৫০						২৫	৪৪৮.৫
১৯৯৯				১২০					৬০	১৮০
২০০০					৪০					৪০
২০০১					১০০					১০০
২০০২					২৭				২৫	৫২
২০০৩					৬৬.৬৯				২৫	৯১.৬৯
২০০৫							৩০			৩০
২০০৬						২৫	২০	২৫		৭০
২০০৭				১০০	৫০				১০০	২৫০
মোট	২৪৯৫	২০১০	৩৮৮৩.৫০	৪৯৬৬	১৬৩৭.৬৯	২৫১৭	৩৩৮৩	৭৯.৫৯	২৮৬৮.৯৮	২৩৮৪০.৭৬

Source : Coastal Forest Department, 2008

টেকনাফ উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়ন

সন	বনায়ন স্থান	প্রকল্পের নাম ও বনায়নের পরিমান (একর)					
		CAP	MAP	FP	FRMP	EFRMP	CGBP
১৯৭৪-৭৫	টেকনাফ সদর	২৫.০					
১৯৭৫-৭৬	টেকনাফ ও শাহ্ পরীরদ্বীপ	৩৫০.০					
১৯৭৬-৭৭	টেকনাফ, শাহ্ পরীরদ্বীপ ও হ্নীলা	৫১৫.০					
১৯৭৭-৭৮	শাহ্ পরীরদ্বীপ ও হ্নীলা	২৬৫.০					
১৯৭৮-৭৯	শাহ্ পরীরদ্বীপ ও হ্নীলা	৪৫০.০					
১৯৭৯-৮০	শাহ্ পরীরদ্বীপ ও হ্নীলা	৩০০.০					
১৯৮০-৮১	টেকনাফ ও শাহ্ পরীরদ্বীপ		২০০.০				
১৯৮১-৮২	শাহ্ পরীরদ্বীপ		২৫০.০				
১৯৮২-৮৩	শাহ্ পরীরদ্বীপ ও কাটা বনিয়া		৬৫০.০				
১৯৮৩-৮৪	শাহ্ পরীরদ্বীপ		৩০০.০				
১৯৮৪-৮৫	টেকনাফ সদর		১০০.০				
১৯৯১-৯২	টেকনাফ ও শাহ্ পরীরদ্বীপ			৫০.০			
১৯৯২-৯৩	টেকনাফ, শাহ্ পরীরদ্বীপ ও হ্নীলা				৬৩.৬৪		
১৯৯৩-৯৪	টেকনাফ, শাহ্ পরীরদ্বীপ ও হ্নীলা				৪৯.২৯		
১৯৯৪-৯৫	শাহ্ পরীরদ্বীপ				৮.০৯		
১৯৯৫-৯৬	সিজিপি বাঁধ ও হ্নীলা						দৈর্ঘ্য-৩ কিঃ মিঃ
১৯৯৮-৯৯	হ্নীলা				৪.০৪		
১৯৯৯-২০০০	এফআরএমটি-হ্নীলা, সিজিপি বাঁধ হ্নীলা, হ্নীলা সড়ক, শাহ্ পরীরদ্বীপ				৮.০৯		দৈর্ঘ্য-২৯ কিঃ মিঃ বনায়ন ৪.০৫
২০০০-০১	শাহ্ পরীরদ্বীপ সড়ক,টেকনাফ সদর সড়ক						দৈর্ঘ্য - ৮ কিঃ মিঃ বনায়ন ৪.০৫
২০০৩-০৪	হ্নীলা					১০.১২	
মোট		১৯০৫.০	১৫০০.০	৫০.০	১৩৩.১৫	১০.১২	দৈর্ঘ্য-৪০ কিঃ মিঃ বনায়ন ৮.১০

Source : Coastal Forest Department, 2004

CAP = Coastal Afforestation Project, MAP = Mangrove Afforstation Project, FM = 2nd Forest Project, FRMP = Forest Resource Management Project, EFRMP = Extended Forest Resource Management Project, CGBP = Coastal Green Belt Project

ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থায়িত্বশীল কৌশল

Bangladesh Coastal Zone Policy 2005 এর সেকশন ৪.৪.৭ এ-তে বলা হয় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য উপকূলীয় এলাকায় (নতুন জেগে উঠা চরসহ) প্রয়োজনীয় বনায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। কিন্তু বনবিভাগের চলমান প্রকল্প সমূহের মধ্যে উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্প নাই। ফরেস্টি সেক্টর প্রজেক্ট (এফএসপি) (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৫-০৬) চরের জমি বনায়নের জন্য শুধুমাত্র একটি ধারা সংযুক্ত করেছে।

বস্তুত উপকূলীয় বনায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ যাহা দীর্ঘমেয়াদী ফল বয়ে আনবে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ণ কার্যক্রম বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীল ভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে কতিপয় দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হাতে নেয়া যেতে পারে। যেমন-

- সাইক্লোন/সুনামি ও বন্যা পরবর্তী উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরের সুনামী এবং ২০০৭ সালের সাইক্লোন সিডর প্রমাণ করে যে, সুনিবিড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট উপকূলীয় প্রতিবেশ ও বসতিতে ক্ষতির মাত্রা কমিয়েছে।
- বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা অক্ষুন্ন রেখে ম্যানগ্রোভ বাফার (Buffer) জোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশগত পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সুন্দরী গাছের আগা মরা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং World Heritage সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো উদঘাটন করা।
- Remote Sensing & GIS Technology ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের পর্যায় ক্রমিক পরিবর্তন মনিটর করা।
- ক্ষতিগ্রস্থ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে ম্যানগ্রোভের পুনর্বনায়ন এবং পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়া।
- ম্যানগ্রোভ এলাকায় চিংড়ি চাষের নীতিমালা পুন:মূল্যায়ন করে উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগন, পর্যটন শিল্প ও অন্যান্য বিভাগের সমন্বয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
- নীতি প্রনয়ন ও নীতি বাস্তবায়নে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণের কৌশল এবং ম্যানগ্রোভ বনায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

References

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 1994 Population Census 1991. Analytical Report, Volume 1

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS, 1999a. Census of Agriculture 1996

Bangladesh Buraeu of Statistics (BBS), Population Census 2001

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2002b. Poverty Monitoring Survey Report 1999

Chowdhury K. Rezaul et al. Southeast Coastal Belt Study, COAST Trust, 1999

Chowdhury A.M et.al. Monitoring of Tropical Cyclone of May 1997 that Hit Bangladesh Using Data from GMS-5 satellite, Journal of Remote Sensing and Environment, Vol-2, 51-53, 1998

Gray WM. Global review of the origin of tropical disturbances and storms. Monthly Weather Review, 96: 1968 (669-700 pp.)

Intergovernmental Panel on Climate Change Report, 2001, 2003

Integrated Coastal Zone Management of the Government of Bangladesh: Report on Coastal Livelihoods June 2003

Environmental Assessment of the Bay of Bengal Region. Swedish Centre for Coastal Development & Management of Aquatic Resources (SWEDMAR), BOBP/RDP/67, 1994

PDO-ICZMP, 2003. Coastal Livelihoods: situation and context. Working Paper WPO 15

Talukder J and Ahmed M (eds.). The April disaster: Study on cyclone-affected region in Bangladesh, community development library, Dhaka, 1992.

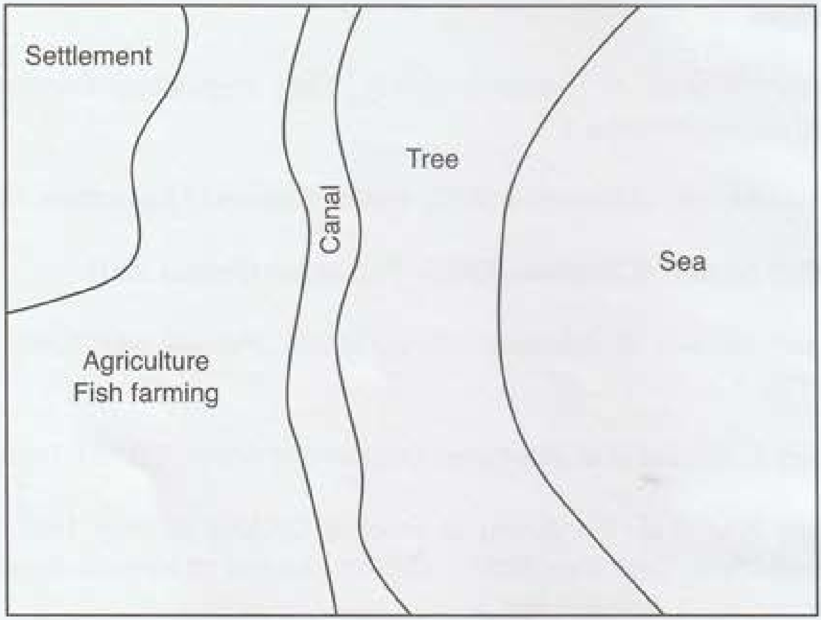

উপকূলীয় বনাঞ্চল সংরক্ষণ
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সারাক্ষণ

Who We are

Institute of Marine Sciences and Fisheries (IMSF), University of Chittagong is the premier academic organization in the field of marine science and fisheries studies in Bangladesh. IMSF provides science-based solutions to address coastal challenges impacting the liveslihoods of poor people. MSF also undertake various activities in the forms of workshop, seminar and field studyu in collaborative approach.

School of Earth and Environment at Leeds University combines worls-class earth and environmental sciences with environmental social sciences in both fundamental and applied research. School of Earth and Environment works in collaboration with other faculties and institutes within the University, national and international colleagues, as well as ith industry and governments. Breadth of expertise ranges from geophysics and surface processes to atmospheric science, climate change and environmental sustainability.

Participatory Research and Development Initiative PRDI is an independent, non-profit and progressive policy, research, and implementation institute in Bangladesh. PRDI aims to promote alternative development ideas and policies through its interactive activities like research, innovation, advocacy, solidarity and action. PRDI equally gives importance to environmental justice for sustainable development, social justice for women and minority rights, and north-south dialogue for harmonizing growth and trade justice.

participatory research
& development initiative
technology innovation & transfer for life & livelihood

UNIVERSITY OF
LEEDS

BRITISH
COUNCIL

We acknowledge assistance from the British Council Bangladesh in the Publication of this Handbook